মুনিয়ার বিয়ে

শুজা রশীদ

১

বাসায় ফিরতে ফিরতে মুনিয়ার সাধারণত একটু রাত হয়। নতুন কাজ। বস এক গাদা ডকুমেন্ট ধরিয়ে দিয়েছে। পড়, শেখ। কম্পিউটার সায়েন্সে গ্রাজুয়েশন শেষ করার সাথে সাথেই মন্ত্রের মত কাজটা হয়ে গেল। মুনিয়া যতখানি না খুশি হয়েছে তার চেয়ে শতগুন বেশী আনন্দিত হয়েছে তার বাবা-মা। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজনদের মিষ্টি পর্যন্ত খাওয়ানো হয়েছে।

ড্রাইভ ওয়েতে গাড়ী রেখে তর তর করে দোতলায় উঠে এলো মুনিয়া। স্কারবরোর বাঙ্গালী পাড়ায় বাড়ি, নীচতলায় ভাড়াটে, ওপরে থাকে ওরা তিনজন – বাবা রাব্বি, মা শিলা এবং সে। ছোট পরিবার, সুখী পরিবার। মুনিয়ার কাছে চাবি থাকে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই বুঝল ডালমে কুছ কালা হ্যায়। বাপী লিভিংরুমে খবরের কাগজের মধ্যে মাথা গুঁজে পড়ে আছে, মামনি রান্না ঘরে, নিঃশব্দে রান্না করছে। এমনটা সচারাচর দেখা যায় না। দু'জনের মধ্যে গলায় গলায় ভাব। সারাক্ষণ এটা সেটা নিয়ে খুনসুটি করতেই থাকে। একটা কাপড়ের দোকান আছে রাব্বির, ড্যানফোর্থ রোডের উপরেই। প্রায়ই দেখা যায় খদ্দের পাতি কম থাকলে সে দোকান বন্ধ করে বাসায় চলে আসে, স্বামী স্ত্রী তে মিলে চা নাস্তা খায়, মাঝে মাঝে হাঁটতে বের হয়। মুনিয়ার খুব ভালো লাগে। চারদিকে এতো পরিবারে ঘুন ধরতে দেখেছে যে তার বাবা-মায়ের এই মধুর সম্পর্ক দেখে তার মন জুড়িয়ে যায়। কিন্তু আজ কি হল?

নিজের ঘরে ঢুকে হাতের ব্যাগ বিছানায় ছুড়ে ফেলে লিভিংরুমে চলে এলো। "বাপী! এটা তো দু' দিন আগের কাগজ। আজকের কাগজ আসে নি?"

রাব্বি নীরবে মাথা নাড়ল। হ্যাঁ কি না বোঝা গেল না। "চা খেয়েছ?" মুনিয়া নরম গলায় জানতে চাইল। ঝগড়া ঝাটি যদি হয়ে থাকে সেটা মায়ের কাছেই জানা যাবে।

আবার মাথা নাড়ল রাব্বি, খাবে কি খাবে না বোঝা গেল না। মুনিয়া রান্না ঘরে চলে এলো। শিলা এক নজর তাকিয়ে ওকে দেখে আবার রান্নায় মনযোগ দিল। "কাজ কেমন লাগছে?"

"ভালো। ঘটনাটা কি তাই বল? আমাদের বুড়ো খোকা পুরানো কাগজে মুখ গুজে বসে আছে কেন?"

সাধারণ ঝগড়া ঝাটি হলে এই পর্যায়ে ঠোঁট টিপে হাসত শিলা। আজ তার ব্যাতিক্রম হল। মনে মনে প্রমাদ গুনল মুনিয়া।

“সমস্যা তো তোকে নিয়েই হচ্ছে,” শিলা বিড়বিড়িয়ে বলল।

আকাশ থেকে পড়ল মুনিয়া। “কেন? আমি কি করলাম?”

“কিছু করিসনি। করলেই হয়ত ভালো ছিল।”

“মামনি, ব্যাপারটা খুলে বলত। এইরকম রহস্যময় কথাবার্তা আমার ভালো লাগছে না।”

শিলা তরকারীতে লবন চাখছে, মনে হল ইচ্ছে করেই একটু বেশী সময় নিল। “তোর লীলা আন্টি এসেছিল।”

লীলা আন্টি! মুহুর্তের মধ্যেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল মুনিয়ার কাছে। “ঘটক আন্টি কি আবার কোন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল?”

“তোর ঘরে টেবিলে বায়ো ডাটা আছে।”

“নিশ্চয় তুমি আসতে বলেছ,” মুনিয়া একটু বিরক্ত হয়ে বলে। সে ইউনিভার্সিটিতে ঢোকার পর থেকেই মা এই ঘটক আন্টির সাথে আঁতাত পাতিয়ে তার জন্য ছেলে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাপীর রাগের কারণটা এবার বোঝা গেল। সে মেয়ের বিয়ে ঝট করে দিতে চায় না। কষ্ট করে পড়াশুনা করেছে, আগে ক্যারিয়ার গড়ুক, পরে বিয়ে। বিয়ে তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

শিলা ঝাঁঝের সাথে বলল, “বাপের সাথে আঁতাত করিস না। চারদিকে তাকিয়ে দেখেছিস কত মেয়েরা আইবুড়ো হয়ে বসে আছে, বিয়ে হচ্ছে না। বাপ-মা প্রেম ট্রেম করতে দেয় নি, কোন ভালো ছেলেও আনতে পারে নি, মেয়েগুলো চাকরী করছে আর বুড়ী হচ্ছে। আমার মেয়েকে আমি সেরকম হতে দেব না।” শেষে উক্তিটুকু গলা বাড়িয়ে লিভিংরুম উপলক্ষে ছুড়ে দেয়া।

“অল্প বয়েসে বিয়ে করে নিজের সত্বা বিকিয়ে দেবার চেয়ে আইবুড়ী থাকাও ভালো,” রাব্বিও গলা উঁচিয়ে জবাব দিল।

“দেখেছিস কি ধরণের কথা বলে? ওর কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে?” শিলা মুনিয়ার কাছেই বিচার দিল।

মুনিয়া জানে তার মাকে বোঝাতে গেলে দশ কথা শুনতে হবে। মেয়ে আইবুড়ো থাকবে এই ভয়ে বহুদিন ধরেই শিলার ঘুম হারাম হয়ে গেছে। সে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে বায়ো ডাটাটা হাতে নিয়ে লিভিংরুমে চলে এলো। বাবার পাশে বসে দ্রুত চোখ বোলাল। ছেলেটারও কম্পিউটার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড। একটা ব্যাংকে প্রোগ্রামার এনালিস্ট হিসাবে কাজ করছে। বছর তিনেক। যার অর্থ সামান্য বড় মুনিয়ার চেয়ে। দেখতে টেখতে ভালোই। পছন্দ না হবার মত না। পরিবারও ভালো। টরন্টোতে রিচমন্ড হিলে বাড়ী। বাবা একাউন্টেন্ট। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে অনেকেই খুব শিক্ষিত, কয়েকজন দেশে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। সব দিক দিয়েই সোনায় সোহাগা। এত দিন ঘটক আন্টি যে ধরণের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে সেগুলোর চেয়ে অনেক ভালো। এটাকে কাটানো সমস্যা হবে।

রাব্বি খবরের কাগজ থেকে চোখ সরিয়ে বিরক্ত কণ্ঠে বলল, “কি দেখছিস এতো?”

মুনিয়া মুখ বাঁকাল। "কোথা থেকে যে এইসব নিয়ে আসে লীলা আন্টি। সময় নষ্ট।" বায়ো ডাটা টা হেলায় সোফার উপর ছুড়ে দেয় সে।

রাব্বির মুখে হাসি ফুটল। "তোর মাকে তো বোঝানো যায় না। যাকে দেখেই তাকেই পছন্দ। মন দিয়ে চাকরী কর। CEO হবি একদিন।"

মাথা দোলাল মুনিয়া। "ঠিকই বলেছ বাবা। এই সব বিয়ে টিয়ে করে জীবন বরবাদ করার কোন মানে হয়?"

রান্না ঘর থেকে শিলা খুন্তি হাতে ছুটে এলো। "কি বললি?"

রাব্বি বলল, "যা সত্য তাই বলেছে। আমার মেয়েটা তোমার কি সমস্যা করছে যে তুমি তাকে বিদায় দেবার জন্য ব্যাস্ত হয়ে পড়েছ?"

শিলা ভ্রু কুঁচকে তাকাল। "মেয়ে তোমার একার? আমি ওকে পেটে ধরিনি? বড় করিনি? বিয়ে হলেই দূরে চলে যাবে কেন? কাছাকাছি বিয়ে দেব।"

রাব্বি খবরের কাগজে ফিরে গেল। "ও এখন বিয়ে করবে না।"

মেয়ের দিকে তাকাল শিলা। "তুই বলেছিস এই কথা?"

বড় করে মাথা নাড়ল মুনিয়া। রাব্বি কাগজ থেকে চোখ সরিয়ে তার দিকে তাকাতেই মাথা নাড়ানোর দিক বদলে উপরে নীচে করতে লাগল। শিলা ধমকে উঠল। "একবার মাথা নাড়ছিস, আরকবার দোলাচ্ছিস – হ্যাঁ কি না সেটা পরিষ্কার করে বল।"

বিপদে পড়ে গেল মুনিয়া। বাবা-মা দু'জনাই বড় বড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে ইতস্তত করে বলল, "তেমন ভালো ছেলে টেলে তো পাওয়া যাচ্ছে না..."

শিলা দ্রুত বলল, "এই ছেলেটার কি সমস্যা? সব দিক দিয়ে ভালো। দেখতে ভালো, ভালো কাজ করে, ফ্যামিলি ভালো, কাছাকাছি থাকে – আর কি ভালো হতে হবে? নাকি তোর কেউ আছে? কখন তো কিছু বলিস নি।"

রাব্বি কাগজ নামিয়ে রেখে বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে আছে। মুনিয়া হেসে ফেলল। "কি যা তা বলছ, মামনি?"

শিলা চেপে ধরল। "পরিষ্কার করে বল তোর পছন্দের কেউ আছে কি নেই?"

"নেই। বললাম তো।" মুনিয়া বিরক্ত হবার চেষ্টা করে। রাব্বির মুখে হাসি ফিরে এসেছে, দৃষ্টি নমনীয় হয়েছে।

শিলা বলল, "জানতাম। তবুও তোর মুখ থেকেই শুনে নিলাম। এই বায়ো ডাটাটা আমার ভালো লেগেছে। দেখতে তো ক্ষতি নেই। ওরা এই শনিবারে আসবে তোকে দেখতে।"

মুনিয়া নার্ভাস ভঙ্গীতে বাবার দিকে তাকাল। "এই শনিবার? বাপী?"

গররর করে বিড়বিড়িয়ে কিছু একটা বলল রাব্বি। এবার পরিষ্কার হল তার রাগ করবার আসল কারণ। কাগজের পেছনে মুখ ঢাকল আবার।

শিলা বলল, "আচ্ছা, দেখতে এলেই কি বিয়ে হয় যায়? দেখতে তো ক্ষতি নেই। তারা আসুক। পরিচয় হোক। ছেলে মেয়েতে দেখা হোক। যদি ওদের পরস্পরকে পছন্দ হয় তার পরে না অন্য আলাপ। তোর বাবাকে এটা বোঝানো যায় না। আমার উপর খামাখা গাল ফুলিয়ে আছে।"

রাব্বি চাঁপা গলায় বলল, "চণ্ডালিনী!"

শিলা খুন্তি হাতে এক পা এগিয়ে এলো, "আবার বললে দেব একটা বাড়ি!"

২

ছেলেপক্ষ এলো শনিবার সন্ধ্যায়। আসবার কথা ছিল আটটার দিকে, তারা এলো কাঁটায় কাঁটায় আটটায়। ছেলের সময় জ্ঞান নাকি সাংঘাতিক। রাব্বি গজরাতে গজরাতে বলল, "বাড়াবাড়ি!"

শিলা প্রচুর রান্না বান্না করেছে। বাড়ী সুন্দর করে সাজিয়েছে। মুনিয়াকে একটা সবুজ শাড়ি পরতে হয়েছে, চুল খোপা করতে হয়েছে। মেকআপ করবার পর তাকে একেবারে মুভির নায়িকাদের মত লাগছে। রাব্বি ভ্রু কুঁচকে ওকে কয়েকবার দেখেছে। "এতো সুন্দর করে সাজবার কি দরকার ছিল?"

শিলা মুখ ঝামটা দিয়েছে, "ওকে দেখতে আসছে। ও কি ভুত সেজে থাকবে?"

শিলা লীলাকেও দাওয়াত দিয়েছে। মোতালেব পরিবারের সাথে তারই ঘনিষ্ট সম্পর্ক। তাদেরই একমাত্র ছেলে রাজুর বিয়ের ঘটকালী করছে সে। মোতালেবের স্ত্রী বীনা নাকি এক সময় তার সাথে এক স্কুলেও পড়েছে।

মোতালেবের বয়েস রাব্বির মতই। তবে সে বেশ মুটিয়ে গেছে। তার মাথার চুলও বেশ পড়ে গেছে। রাব্বি এখনও শরীরটাকে মজবুত রেখেছে। পারিবারিক সুত্রে তাদের টাক নেই, ফলে তার মাথা ভর্তি চুল। লিভিংরুমে মুখোমুখি বসে মনে মনে একটু ভালো বোধ করছে রাব্বি। ব্যাটা আকাউন্টেন্ট, খুব ভাব ধরে BMW চালিয়ে এসেছে, ভেবেছে দোকানদারকে তার জৌলুস দেখিয়ে কাবু করে দেবে। হোদল কোতকোত! তার স্ত্রী বীনা অবশ্য সুন্দরী এবং খুব হাসি খুশি। তাকে অপছন্দ করবার কিছু নেই। তাদের ছেলেটি খুব ফিটফাট হয়ে এসেছে, কোট-প্যান্ট-টাই, একেবারে সাহেব। তবে দখে ভদ্র সদ্র মনে হচ্ছে। একটু মনে হয় ঘাবড়ে আছে। মুনিয়ার সাথে 'হাই' বলেছে, মুরুব্বীদের সালাম দিয়েছে, তারপর থেকে একেবারে চোখ নামিয়ে বসে আছে। মনে মনে একটু বিরক্ত হচ্ছে রাব্বি। একটু স্মার্টগিরি দেখালে ভালো হত, অপছন্দ করতে কষ্ট করতে হত না। বাক বাকুম করা ছেলেদের একেবারে দু চোক্ষে দেখতে পারে না রাব্বি। লীলা বসে আছে দু' দলের মাঝখানে একটা গদি মোড়া চেয়ারে। তার সাজগোজ দেখে মনে হচ্ছে বিয়ের কন্যা যেন সে-ই। প্রাথমিক আলাপচারীতা শেষ হবার পর দুই পক্ষই একটু চুপ। শুধু মোতালেব রাব্বির দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে সমানে নিঃশব্দে হেসে চলেছে। অসম্ভব বিরক্ত হচ্ছে রাব্বি।

ব্যাটা কি চিড়িয়া দেখছে নাকি? তার অস্বস্তি দেখে মোতালেব যেন আরোও আনন্দ পেল। এবার সশব্দে হেসে উঠল সে। "আমাকে চিনতে পার নি?"

রাব্বি চমকাল। "মানে?"

মোতালেব বলল, "ভালো করে দেখ। প্রায় ছত্রিশ বছর পর দেখা। আমার অনেক চেঞ্জ হয়েছে। তোমাকে দোষ দেই না। তবে তুমি কিন্তু এখনও একদম আগের মতই আছো।"

রাব্বি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল। ব্যাটাকে চিনতে না পারার যথেষ্ট কারণ আছে। উনিশ বিশ বছরের মোতালেব ওরফে মতু ছিল হ্যংলা পাতলা, বাবরী চুলো যুবক।

"মতু!"

হা হা করে হাসল মোতালেব। "এই তো চিনেছ। এসো কোলাকুলি করি। এতোদিন পর দেখা।"

মোতালেব দু' হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছিল, রাব্বি কড়া গলায় বলল, "থামো!"

তার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল, সবাই চমকে উঠল। মোতালেবের মুখের হাসি মুছে গেল।

রাব্বি তার দিকে এক পা এগিয়ে গিয়ে তীব্র কণ্ঠে বলল, "ছত্রিশ বছর কেন, ছত্রিশ হাজার বছর পার হলেও তোমার মত হারামীর সাথে আমি কোলাকুলি করব না। তোমার পরিবার নিয়ে এক্ষুনী আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও।"

শিলা আর্তচীতকার করে উঠল, "কি বলছ এসব? মুনিয়ার বাবা, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?"

মুনিয়াও বিস্মিত দৃষ্টিতে তার বাবাকে দেখছে। তাকে এইভাবে রাগতে সে কখন দেখেছে বলে মনে করতে পারে না। রাজু এবং বীনা ও ভড়কে গিয়ে সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। লীলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, "হচ্ছে কি এসব? রাব্বি ভাই? এমন করছেন কেন?"

রাব্বি তার দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "লীলা ভাবি, দয়া করে এদেরকে নিয়ে এক্ষুনী বিদায় হন। এই লোকটার মুখ আমি আর কখন দেখতে চাই না। বদমাশ। ওর ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দেয়াতো দূরে থাক, ও যে শহরে থাকে সেই শহরের ত্রিসীমানায় আমি আমার মেয়েকে যেতে দেব না।"

মোতালেব বিব্রত কণ্ঠে বলল, "তুমি এখনও আমার উপর রেগে আছো? কবেকার ঘটনা..."

রাব্বি তার নাকের ডগায় আঙ্গুল নাড়িয়ে বলল, "বেরিয়ে যাও। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় সাবধানে নামবে। পড়ে টড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙে আমার নামে কেস ঠুকে দেবে, সে সব হবে না।"

শিলা স্বামীর কাণ্ড দেখে একেবারে হতবাক হয়ে গেছে। তার মনে হচ্ছে সে এখনই মূর্ছা যাবে। মাথাটা ঘুরছে। এমনিতেই ইদানীং ভার্টিগোর সমস্যা দেখা দিয়েছে। মুনিয়া সময়মত টের পাওয়ায় শিলা মেঝেতে পড়ল না। সে মাকে ধরে সোফায় বসিয়ে দিল। মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল শিলার।

শিলার যখন জ্ঞান ফিরল, সে তখন নিজের বছানায় শুয়ে আছে। পাশেই মুনিয়া বসে, মাথায় হাত বুলাচ্ছে। কতক্ষন পেরিয়ে গেছে কে জানে। "মামনি, এখন ভালো লাগছে?" মুনিয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল।

"ওরা কি চলে গেছে?" শিলা কাঁতর কণ্ঠে জানতে চায়।

মাথা দোলাল মুনিয়া। হ্যাঁ। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল শিলা। "ঐ পাগলটার সাথে আমি জীবনে কথা বলব না।"

রাব্বি কাছেই একটা চেয়ারে উদ্বিগ্ন মুখে বসে ছিল। সে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, মুনিয়া চোখ মটকাল। চেপে গিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রাব্বি। শিলা চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল, "ঐ পাগলটা কেন এমন করল? কিছু বলেছে তোকে?"

মাথা নাড়ল মুনিয়া। শিলা বিড়বড়িয়ে বলল, "ইচ্ছে করে করেছে। বিয়েটা যেন না হয়। ছিঃ ছিঃ। আমি কাউকে মুখ দেখাব কি করে? লীলা ভাবী আর কখন কোন সম্পর্ক নিয়ে আসবে? তোর এখন কি হবে রে?"

মুনিয়া ফিক করে হেসে ফেলল। "আমি মনে হয় আইবুড়োই থেকে যাবো মামনি।"

শিলা আহত দৃষ্টীতে তার দিকে তাকাতে সে দ্রুত সামাল দিল, "ঠাট্টা করছি মামনি!"

৩

লাঞ্চ টাইমে সাধারণত ক্যাফেটারিয়ায় চলে যায় মুনিয়া। ওর সাথে আরও কয়েকজন নতুন ঢুকেছে, কাছাকাছি বয়েসের। ওরা একসাথে যায়। মুনিয়া শরীর সচেতন। লাঞ্চে সামান্যই খায়। গল্পই বেশী হয়। এক পিস পিজা আর একটা সফট ড্রিংকস নিয়ে বসে বন্ধুদের কথাই শুনছিল। হঠাত টং করে শব্দ করল ফোনটা। টেক্সট মেসেজ। বাবা প্রায়ই এটা সেটা নিয়ে মেসেজ করে। ফোন বের করে চেক করল। অজানা প্রেরক। "আমার সাথে দয়া করে একটু দেখা করবেন?"

চমকাল মুনিয়া। কোন বদমাশ নয়ত? চেনা নেই জানা নেই, দেখা করতে চাইবে কেন? নাম্বারটা আবার লক্ষ্য করল, পরিচিত নয়। মুছে দিতে যাচ্ছিল, আরেকটা মেসেজ এল, একই নাম্বার থেকে। "সরি, পরিচয় দিতে ভুলে গেছি। আমি রাজু।"

ভ্রু কুঁচকাল মুনিয়া। কে রাজু? নামটা পরিচিত মনে হল না। তৃতীয় আরেকটা মেসেজ এলো। "বাবা-মায়ের সাথে আপনাদের বাসায় গিয়েছিলাম।"

হাঁফ ছাড়ল মুনিয়া। এবার পরিষ্কার হল। প্রায় সপ্তাহ দুয়েক পেরিয়ে গেছে তার পর। সব পক্ষই শীতল হয়ে গেছে। মুনিয়া ওসব নিয়ে আর মোটেই ভাবে নি। ছেলেটার নামটা তার একেবারেই খেয়াল ছিল না। একটু বিপদে পড়ে গেল। রাজু তার সাথে কেন দেখা করতে চায়? ছেলেটা মন্দ নয় কিন্তু দেখা টেখা করত গিয়ে আবার কোন ঝামেলায় পড়ে যাবে কিনা কে জানে? বাবা কাউকে কিছুই খুলে বলে নি এখন পর্যন্ত। দুই বন্ধুতে ছত্রিশ বছর

আগে কি হয়েছিল কে জানে। লীলা আন্টির সাথে শিলার কথা হয়েছে। মোতালেব ওরফে মতুও নাকি কোন রহস্য ফাঁস করে নি। যাই হয়ে থাক, এই জটিলতার মধ্যে নাক গলাতে চায় না মুনিয়া। বাবার সাথে তার আত্মার সম্পর্ক। সেখানে সে কোন ঝামেলা করতে চায় না। একবার ভাবল ছোট্ট করে লিখে দেয়, "সম্ভব নয়। দুঃখিত।" কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত পাল্টাল। একবার জবাব দিলেই মাথায় চড়ে যাবে। কোন দরকার নেই।

কয়েক দিন পেরিয়ে গেল। মন থেকে ব্যাপারটা পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারে নি মুনিয়া। আনমনে হয়ত আশা করেছিল ছেলেটা আবার অনুরোধ করবে। এত কাল কত ছেলেরা ওর পিছু নিয়েছে, ও নির্বকারে সবাইকে অবহেলা করেছে। জানত বাবা-মা অসম্ভব কষ্ট পাবে। এখন সে সাবালিকা, কর্মজীবি। পরিস্থিতি ভিন্ন। কিন্তু সে এখনও বাবা-মায়ের ভালোবাসার পুত্রী। এক সন্তান হবার অনেক জ্বালা। কিছু করবার আগে দশবার ভাবতে হয় তাকে। বাবা কি কষ্ট পাবে? মা? বাবার চেয়ে তার বুদ্ধি সুদ্ধি বেশী থাকলেও মেয়ে মতের বিরুদ্ধে কিছু করলেই মুখ ফুলে যায়।

শীত পেরিয়ে বসন্ত আসতে চারদিকে প্রকৃতি যেন শরীর ঝাঁকিয়ে চোখ মুছে জেগে উঠেছে, চারদিকে নতুন ফুলের সমারোহ, গাছে গাছে পাতার সমাবেশ। পাখীদের উচ্ছল কিচির মিচির। লাঞ্চ তারাতাড়ি সেরে তারা কয়েকজন একটু হাঁটতে বের হয়। ডাউন টাউনের রাস্তা ধরে খানিকটা হাঁটে। অনেক মানুষ বেরিয়ে পড়ে। ভালোই লাগে। কথা বলতে বলতে ধীরে সুস্থে হাঁটে ওরা। উষ্ণ, আলতো বাতাসটা ভালো লাগে। মনটা ফুরফুরে হয়ে যায়।

ঠিক কেন বলতে পারবে না, কিন্তু পর পর দু'দিন হাঁটতে গিয়ে অফিসের সামনের ল্যাম্প পোস্টটার নীচে দাঁড়িয়ে থাকা একটা দেশী ছেলের উপর চোখ আটকে গেল। মধ্যবিশ, সুদর্শন ছেলে, কেন যেন পরিচিত মনে হয়েছিল। সে কৌতূহলী হয়ে তাকাতে ছেলেটা দ্রুত চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে। মুনিয়া খুব একটা গুরুত্ব দেয় নি। পরের দিনও যখন একই জায়গায় ছেলেটিকে আবার দেখা গেল তখন ওর মনের মধ্যে একটু খুঁত খুঁত করল। এটা কাঁকতলিয় ব্যাপার হবার সম্ভাবনা কম। ছেলেটা আজও অন্য দিকে তাকিয়ে থাকল। সাহস করে একটু কাছে গিয়ে আড় চোখে তাকে ভালো করে দেখার চেষ্টা করল মুনিয়া। রাজু কি? সেদিন রাতে অল্প সময়ের জন্য সামনা সামনি দেখেছিল, ঠিক নিশ্চিত হতে পারল না। কিন্তু সম্ভাবনাটার কথা ভেবে ভালোই লাগল।

তৃতীয় দিন আরেকটা মেসেজ এল। "প্লিজ, একটু দেখা করবেন?" একটু পরেই দ্বিতীয় আরেকটা মেসেজ এলো। "আমি রাজু।"

মুনিয়া হাসি থামাতে পারল না। রাজু ছেলেটা মনে হচ্ছে একটু লাজুক এবং মনভোলা। কি করবে? একটু ভাবল। শেষ পর্যন্ত এবারও কোন জবাব দিল না। একটু বাজিয়ে দেখা যাক। লাঞ্চের পর বান্ধবীদের থেকে দল ছুট হল একটা মিথ্যা অছিলায়। একটু পরে বাইরে বেরিয়ে এলো। ল্যাম্প পোস্টের নীচে ছেলেটা দাঁড়িয়ে। চোখে চোখ পড়ল, প্রথমে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেও কয়েক মুহূর্ত পরে সাহস করে আবার তাকাল রাজু। তার মুখ শুকনো। মনে হল ভয়ে ভয়ে আছে। হাসি চাপল মুনিয়া। ভদ্র, লাজুক ছেলেদের কে না পছন্দ করে? ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে রাজুর সামনে দাঁড়াল। রাজুর সারা মুখে শিশুসুলভ হাসি। মুনিয়া ঠোঁট টিপে হাসল। "রাজু?"

মাথা দোলাল ছলেটা।

“এদিকে কাজ করেন?”

“কাছেই। দশ পনের মিনিটের হাঁটা,” খুশীতে উদ্ভাসিত রাজুর মুখ। হাসলে ছেলেটাকে খুব সুন্দর লাগে, ভাবল মুনিয়া।

“হাঁটবেন? সামনে একটা ছোট পার্ক আছে। ওখানে গিয়ে বসা যায়।” মুনিয়া স্বগতোক্তির মত বলে। ছেলেটার মনে কি আছে না জেনে সে তাকে বেশী লাই দিতে চায় না। বান্ধবীদের মুখে অনেক আতংকজনক গল্প শুনেছে। ভদ্র দর্শন ছেলেরাও রাতারাতি নাকি বদের হাড্ডি হয়ে যেতে পারে।

চোখ জোড়া হেসে উঠল রাজুর, “থ্যাংক ইয়ু! আপনার সাথে একটু কথা না বলতে পারলে আমি দম ফেটে মারা যেতাম।”

একটু দূরত্ব রেখে পাশাপাশি হাঁটছে মুনিয়া। মৃদু গলায় বলল, “কেন বলুনতো?”

রাজু একটু দ্বিধা করে বলল, “পার্কে বসে বলব।”

“হাঁটতে হাঁটতে বলা যায় না?”

“যায়,” মাথা চুলকায় রাজু, “কিন্তু বসে বললে ভালো।”

মুখ টিপে হাসে মুনিয়া। সর্বনাশ। এই ছেলেতো তার প্রেম হাবুডুবু খাচ্ছে। বাবা জানলে কি হতে পারে ভেবে তার কেন যেন ভয়ানক হাসি পাচ্ছে। সে আরেক শিশু।

পার্কে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কিছু বেঞ্চ। তার একটিতে দু’ জনে বসল, যথেষ্ট দুরত্ব রেখে। রাজু ঘামছে।

“আমি বেশীক্ষণ থাকতে পারব না,” মুনিয়া সহজ কণ্ঠে বলল। “কাজে ফিরেতে হবে।”

“আমাকেও,” রাজু লজ্জিত গলায় বলল। “কিভাবে বলব সেটাই ভাবছি। আচ্ছা, সরাসরি বলি। আমাদের বাবাদের মধ্যে কি হয়েছিল জানিনা, কিন্তু আপনাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। আমরা কি মাঝে মাঝে দেখা করতে পারি?”

মনে মনে খুশী হল মুনিয়া। যাক, রাজু বাবুকে যতখানি মুখচোরা মনে হয়েছিল, সে ততখানি নয়। এটা ভালো লক্ষণ। “কেন বলুন তো?” সে বেশ অবাক হবার ভান করল।

কাশল রাজু। “আমাকে বোধহয় আপনার পছন্দ নয়।”

“ভুল বললেন। আপনি চমৎকার ছেলে। আপনাকে নিশ্চয় অনেক মেয়ে পছন্দ করে। প্রশ্ন হচ্ছে, অকারণে দেখা করে কি লাভ?” মুনিয়া মনের কথাই বলল। এতো দিন যদি প্রেম না করে থাকে তাহলে এখন আর সে মুখো হয়ে বাব-মায়ের মনে আঘাত দিতে চায় না। ‘মোতু’ কে দেখে রাব্বির যে ধরণের প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তাতে এই ছেলের সাথে বিয়ে-টিয়ে হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

রাজু বোকা নয়। সে তার মনের কথা পরিষ্কার বুঝতে পারল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল। "সেদিন আপনাকে প্রথম দেখাতেই আমার মনে হয়েছে আমাদের মধ্যে কিছু একটা আছে। সেটার কি কোন মূল্য নেই? আপনি যদি না চান তাহলে আমি আর আপনাকে বিরক্ত করব না, কিন্তু আপনার বাবার মত তো পালটেও যেতে পারে।"

মুচকি হাসল মুনিয়া। "আমার বাবাকে তো চিনি। আপনার বাবার উপর তার যদি ছত্রিশ বছর ধরে এতো কঠীন রাগ থেকে থাকে, সেটা খুব শীঘ্রই যাবে না। আপনি বরং আমার কথা ভুলে যান।"

রাজু তার মুখের দিকে সরাসরি তাকাল। "সত্যি করে বলেন তো, আপনার পছন্দের কেউ আছে?"

হেসে উঠে দাঁড়াল মুনিয়া। "পছন্দের কেউ থাকলে আপনার সাথে আমার দেখা হত? চলেন ফিরি।"

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ হাঁটল রাজু। তার মন ভয়ানক খারাপ হয়েছে। মুনিয়ার ভয় হচ্ছে সে কান্নাকাটি না শুরু করে। "কিছু বলছেন না যে?" পরিবেশটাকে স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করল মুনিয়া।

"আমি আজকেই বাবার সাথে কথা বলব," রাজু গম্ভীর কণ্ঠে বলল। "তার দোষে আমি কেন শাস্তি পাব?"

খিল খিল করে হেসে উঠল মুনিয়া। হাসাটা ঠিক হল না, কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারল না।

রাজু থমথমে মুখে বলল, "হাসির কথা বলিনি। আমি সারাক্ষণ তোমার কথা ভাবি...তুমি করে বলে ফেললাম, চোখ বন্ধ করলে তোমার মুখ দেখি, সেদিন শাড়ীতে তোমাকে কি যে সুন্দর লাগছিল, সেই দৃশ্যটা এখনও চোখে লেগে আছে...আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না।"

মুনিয়া মুচকি হেসে বলল, "বেচারা! নিশ্চয় কখন কোন গার্লফ্রেন্ড ছিল না।"

"আর তোমার কয়টা বয়ফ্রেন্ড ছিল?" রাজু ও তাহলে খোঁচা দিতে জানে! মুনিয়া মুখ ঢেকে হাসে।

"হাসছ কেন?" রাজু মরীয়া হয়ে বলে।

"জানি না।" মুনিয়া সরল স্বীকারোক্তি করল। আসলেই সে জানে না। তার মনটা খুব ফুরফুরে লাগছে, ছেলেটার অভিমানি মুখ আর আদুরে কথা বার্তা খুব ভালো লাগছে, হাসিটা মনের গভীর থেকে আপনমনে কুলকুলিয়ে উঠে আসছে। এতোকাল প্রেম করবার জন্য পাগল হয়ে ছিল। শেষ পর্যন্ত বুঝি সেই প্রতীক্ষার অবসান হল। কিন্তু বাবাকে নিয়ে কি করা যাবে?

বিদায় নেবার আগে রাজু সাহস করে জানতে চাইল, "কাল কি করবে?"

"হয়ত হাঁটতে বের হব। একই সময়ে।" মুনিয়া রিভলভিং ডোর দিয়ে ভেতরে ঢুকবার আগে সংক্ষেপে বলে গেল। রাজুর প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য মুখ ফিরিয়ে তাকাল না। নিশ্চয় বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে গেছে।

এবারের বসন্ত যেন এসেছে চারদিকে সব কিছু তোলপাড় করে দেবার জন্য। গাছের পাতায় ঘন সবুজ বর্ণ, ফুলের রঙ হয়েছে চোখ ধাঁধান, পাখীদের গানে দুনিয়া মুখরিত, আকাশে মেঘের এমন খেলা যেন শত বছরেও হয় নি। মুনিয়ার মনে নির্ঘাত রঙ লেগেছে। তারও ইদানীং ঘুমে কিঞ্চিৎ সমস্যা হচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ রাজুর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সেদিনের পর অফিস খোলা থাকলে প্রায় নিয়মিত দেখা হচ্ছে দু' জনার, হাঁটে, কথা বলে, একটু একটু করে দ্বিধা দ্বন্দ্বের বাঁধ ভাঙতে শুরু করেছে। একদিন লাঞ্চেও গেছে দু'জন। রাজুর সঙ্গ মুনিয়ার ভালো লাগে, তার হাঁটার ধরণটা ভালো লাগে, ভারী কণ্ঠস্বরটা ভালো লাগে। মনে মনে খুব বিব্রত বোধ করে সে। যাহ্, কি সমস্যা হয়ে গেল!

মাস খানেক ঝট করেই পেরিয়ে গেল। গ্রীষ্মের উষ্ণতা চারদিকে মুখরিত করে ছুটে এসেছে। ছয় মাস শীতের প্রকোপে কাঁপাকাঁপি করবার পর এই উত্তাপ সবাই খুব উপভোগ করছে। উত্তাল হাওয়ায় চারদিকে আনন্দ আর উত্তেজনার মাতামাতি। মুনিয়ার খুব ভেসে যেতে ইচ্ছে করে। সব বাঁধ ভেঙে দিতে ইচ্ছে করে।

পার্কের প্রথম দিনের সেই বেঞ্চটা ওদের এখন খুব প্রিয় স্থান হয়েছে। দু'জনের মাঝের দূরত্ব কমতে কমতে প্রায় শুন্যতে এসে পড়েছে। হাত ধরাধরি জাতীয় ব্যাপার এখনও হয় নি। হবার কোন সম্ভাবনা আছে বলেও মনে হয় না। এমন অভদ্র কাজ রাজু নিজ উদ্যোগে কখনই করবে না। হয়ত কোন এক দিন এক পাতার একটা এপ্লিকেশন লিখে আনবে – মুনিয়া কি দয়া করে রাজুকে তার হাত ধরতে দেবে? এই ছেলের পক্ষে সেটা অসম্ভব নয়।

"তোমার বাবার সাথে কথা বলেছ?" পাশাপাশি বসে জানতে চায় মুনিয়া।

মাথা নাড়ল রাজু। না। "কি করে বলব? বাবা ঐদিন অনেক অপমানিত হয়েছে। ঐ প্রসঙ্গ তুললে যদি রেগে যায়?"

"ঠিক বলেছ," মুনিয়া বলল। "লীলা আন্টি আরও কয়কটা ছেলের খবর নিয়ে এসেছে। তাদের যেমন চেহারা, তেমন গুন। বাবাও দেখলাম বায়ো ডাটা নিয়ে ঘাটা ঘাটি করছে..."

দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল রাজু। "আচ্ছা, আমি কি তোমার বাবার সাথে গিয়ে কথা বলব? আমি তো কিছু করিনি। আমার কি দোষ?"

"কথা বলবে না। বের করে দেবে। ভীষণ ত্যাড়া।" মুনিয়া বাড়িয়ে বলে নি। ঠিক সেটাই হবার সম্ভাবনা ষোল আনা।

"তাহলে?" রাজু বিশাল একটা প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত তাকিয়ে আছে। যেন এই সমস্যার সমাধান একমাত্র মুনিয়ার কাছেই আছে। তাকে দোষ দিতে পারল না মুনিয়া। মাকে বলে কোন লাভ নেই। মা ওর পক্ষ নেবে। কিন্তু বাবা যদি নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয় তখন কি হবে? তার মতের বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলেই সে এটা করে। অর্ধেক বেলা যেতে পারে না মা, মেয়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে তার উপোস ভাঙ্গায়। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করা যায় না।

মুনিয়া অস্থির ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াল। "আমাকেই কিছু করতে হবে।"

রাজু দ্বিধা করে বলল, “শেষে যদি হিতে বিপরীত হয়? তার চেয়ে এভাবেই চলুক না।”

“কেউ দেখে যদি বাবা-মায়ের কানে লাগিয়ে দেয় তাহলে সর্বনাশ হবে। এসব লুকিয়ে রাখা যায় না। কেউ না কেউ একদিন দেখবেই।”

মাথা দোলাল রাজু। কথাটা ঠিক। দেশী বাবা-মাদেরকে নিয়ে এই হয়েছে সমস্যা। চাকুরিজীবি ছেলেমেয়েদেরকেও নাড়ী ছেঁড়া হতে দেবে না।

শুক্রুবার রাতে তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে বাসায় ফিরে আসে রাব্বি। সারা সপ্তাহ ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত দোকানে কাটিয়ে ক্লান্তিতে ভোগে। এটা তার একটু বিলাসীতা। শুক্রুবার সন্ধ্যার আগেই দোকানে তালা ঝুলিয়া দেয়। মুনিয়া কাজ থেকে সোজা বাসায় চলে আসে। শিলা প্রায়ই স্পেশিয়াল কিছু একটা রান্না করে। স্বামী স্ত্রী এবং কন্যাতে খুব খাওয়া দাওয়া, আড্ডা, টিভিতে মুভি দেখা চলে অনেক রাত পর্যন্ত।

আজ কোন কারণে জমছে না। শিলা খিচুড়ী, ভুনা গোশত রান্না করেছে, গন্ধেই মন ভরে যাচ্ছে অথচ মুনিয়া প্রায় কিছুই খাচ্ছে না। শিলার সাথে কয়েকবার চোখাচোখি হল রাব্বির। শ্রাগ করল শিলা। আড়চোখে মেয়েকে দেখছে রাব্বি। সবসময় হাসিখুশী থাকার মেয়ে, হঠাৎ এমন ঠান্ডা হয়ে গেল কেন?

খাওয়া শেষ হতে একটা মুভি লাগিয়ে দিল রাব্বি। শিলা রান্নাঘরের কিছু কাজকর্ম সেরে এসে ওদের সাথে বসল। মুনিয়া এখনও শীতল কিন্তু বাবার পাশেই বসে আছে, চুপচাপ মুভি দেখছে। অন্যদিন বাবা-মেয়েতে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ চলে, খুব হৈ চৈ হয়। আজকের এই নীরবতা ভালো লাগছে না। এক পর্যায়ে আর সহ্য করা গেল না।

“কি রে কাজে কোন সমস্যা হয় নি তো?” রাব্বি জানতে চায়।

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল মুনিয়া।

“মন খারাপ কেন?” শিলা বলল। “কথা বার্তা বলছিস না। তোর বাবার তো হার্ট ফেল করবার অবস্থা হয়েছে, সেটা খেয়াল করেছিস?”

মুনিয়া মুচকি হেসে বলল, “কেন বাপী? তোমার তো আরও খুশি হবার কথা।”

রাব্বি অবাক চোখে মেয়ের দিকে তাকাল। “তুই কি বলছিস আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।”

“বাপী, আমি একটা বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছি। ঠিক করেছি কখন বিয়ে করব না।” মুনিয়া হাসি মুখে ঘোষনা দিল।

শিলা সোফা থেকে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। “কি যা তা বলছিস তুই? একটা সম্পর্ক তোর বাপের দোষে ভেঙে গেল বলে তোকে চিরকুমারী থাকতে হবে নাকি? আরোও পাঁচটা বায়ো ডাটা পেয়েছি। তুই কিচ্ছু ভাবিস না।”

রাব্বি সন্দিহান দৃষ্টীতে মেয়েকে পরখ করছে। "ফাজলামী করছিস নাকি?"

"না বাপী। সত্যি সত্যি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বিয়ে করে জীবনটাকে অযথা নষ্ট করব কেন? দুনিয়ায় আরোও কত কি করার আছে। ঠিক বলেছি না?"

শিলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করল, "না, ঠিক বলিস নি। একটা মেয়ের জীবনে বিয়েটা অনেক বড় ব্যাপার। তোর বাপের কথা শুনে শুনে তোর এইরকম অধঃপতন হয়েছে।"

রাব্বি আড়মোড়া ভাঙল। "তোর এই সিদ্ধান্তটাই ভালো। খামাখা অন্যের গোলামী করবি কেন? তোর মাকে দ্যাখ। ইউনিভার্সিটির তুখোড় ছাত্রী, ফিজিক্সে ডাবল ফার্স্ট ক্লাস। কি হল এতো পড়ে? রান্নাঘরে হাঁড়ি ঠেলছে। আমাকে বিয়ে করবার আগে চাকরী করছিল। চালিয়ে গেলে এতোদিন কোন কম্পানীর বস টস হয়ে যেত।"

শিলা মুখ ঝামটা দিল। "আমার বস হবার দরকার নেই। এই সংসারই আমার কম্পানী। তুমি এই মেয়ের মাথায় আর কোন খারাপ কথা ঢোকাবে না।"

শ্রাগ করল রাব্বি। "আমি ওকে কিছু করতে বলিনি।"

শিলা মেয়ের পাশে এসে বসল। "কি হয়েছে বলত? মিথ্যে বলবি না। লীলা ভাবী বলল রাজু নাকি তোর সাথে দেখা করতে গিয়েছিল?"

রাব্বি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। "কি? সত্যিই? ঐ হারামী ওর ছেলেটাকে পাঠিয়েছে আমার মেয়েটার সর্বনাশ করবার জন্য। ওকে গুলী করে মারব আমি।"

শিলা ধমকে উঠল, "চুপ করে বস তো। কি হয়েছে না শুনেই লাফালাফি।"

মেয়ের দিকে তাকাল রাব্বি। "চুপ করে আছিস কেন? বল, গিয়েছিল দেখা করতে?"

বিপদ কাকে বলে? কেশে গলা পরিষ্কার করল মুনিয়া। বাবা-মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বলাটা তার ঠিক হয়ে ওঠে না। "গিয়ে থাকতে পারে। আমি ঠিক খেয়াল করি নি।"

রাব্বি রেগে গেল। "কি আবোল তাবোল কথা বলছিস? খেয়াল না করলে জানলি কি করে গেছে কি যায় নি?"

"গিয়েছিল তা তো আমি বলিনি," শেষ রক্ষা করার চেষ্টা করে মুনিয়া।

"বেশি চালাকী করবি না," রাব্বি মেয়ের মুখের সামনে গিয়ে ধমকে উঠল। "গিয়েছিল কি যায় নি?"

মুনিয়া কাচুমাচু মুখে বলল, "গেলেই বা কি আর না গেলেই বা কি, আমি তো আর বিয়ে করব না।"

এবার শিলা ধমকে উঠল, "করবি না মানে? ফাজলামী পেয়েছিস? আমাদের কি দশটা বাচ্চা? নাতি নাতনীর মুখ দেখবো না? শুধু এই বুড়োটার বাদরামী দেখতে দেখতে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব? কি সোনার টুকরো ছেলেটা এলো। তার বাবার সাথে ওনার কি হয়েছিল ছত্রিশ বছর আগে, তাই নিয়ে সব ভেস্তে দিল। ইচ্ছে হয় মাথা চেঁছে ন্যাড়া করে দেই।"

রাব্বি তীব্র প্রতিবাদ করল, “সোনার টুকরো ছেলে না পিন্ডী! ওর বাপ কি ধরণের বদমাশ ছিল কোন ধারণা আছে তোমার? একটা বদমায়েশের ছেলে বদমায়েশ ছাড়া কিছু হতে পারে না। পরিবেশ মানুষকে দূষিত করে ফেলে। চেহারা দেখে কখন পটবে না।”

শিলা ভেংচি কেটে বলল, “এই জন্যেই তো তোমাকে বিয়ে করেছিলাম।”

থমকালো রাব্বি। “কেন, আমি কি খারাপ দেখতে?”

খিল খিল করে হেসে উঠল মুনিয়া। কাজটা ঠিক হল না কিন্তু সে সামলাতে পারল না। মেয়েকে অগ্নি দৃষ্টি দিয়ে দগ্ধ করবার চেষ্টা করল রাব্বি। “খুব হাসছিস? তুই জানিস ওর বাপ কত বড় শয়তান?”

“কি করে জানব? উনি কি করেছিলেন তুমি আমাদেরকে বলেছ?” উত্তর টা এলো শিলার কাছ থেকে।

একটু চুপ করে গেল রাব্বি। বসল। “বললে তো আবার আরেক সমস্যা। তুমি যে রকম হিংসুটে, দেখা যাবে আমার জীবনটা আবার বারো ভাজা করেছ।”

চোখ গোল গোল করে ফেলল শিলা। “মেয়ে নিয়ে সমস্যা, ঠিক কিনা? যা ভেবেছিলাম। দু’ই লম্পট কোন একটা মেয়েকে নিয়ে ঝগড়া করেছে। মেয়েটা রাজুর বাবার জন্য তোমার পোদে লাথি মেরেছিল, ঠিক কিনা?”

“নোংরা কথা বলবে না,” রাব্বি আহত কন্ঠে বলল। “পোদ নয়, নিতম্ব বল। আর যা বললে সেটা ঠিক না। মেয়েটা ওর খালাত বোন ছিল। আমার সাথে প্রেম হয়ে যায় যায়, ঐ হারামীটা তার কাছে গিয়ে বানিয়ে বানিয়ে আমার নামে আজগুবী সব কথা বলল। আমি নাকি সব মেয়েকে প্রেমপত্র লিখে বেড়াই। অথচ আমি জীবনে প্রেমপত্র লিখি নি। এই কথা শোনার পর আমার সাথে কোন যোগাযোগই রাখল না রানী। ক’দিন বাদে ওর বিয়ে হয়ে গেল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। বন্ধু হয়ে কেউ কারো এমন সর্বনাশ করতে পারে?” প্রশ্নটা মেয়েকে উদ্দ্যেশ্য করে করা।

মুনিয়া অসম্ভব মানসিক শক্তি খাটিয়ে বুদবুদিয়ে উঠে আসা হাসির দমকটাকে ঠেকিয়ে নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

শিলা কোমরে শাড়ী পেঁচিয়ে এগিয়ে এল। “ও, ছত্রিশ বছর পর এখনও রানী বিবির জন্য খুব প্রেম উঠলে উঠছে, হ্যাঁ? লজ্জা করছে না মেয়েকে এই ইয়ার্কি মারা গল্প শোনাতে?”

রাব্বি ভড়কে গিয়ে বলল, “আরে, এখনকার কথা বলছি না তো। তখন কি হয়েছিল তাই বলছি। রানী কেমন দেখতে তাও আমার আর মনে নেই। কিন্তু যে ছেলে এইরকম একটা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, তার বংশধর কেমন হবে সেটাই চিন্তা কর।”

শিলা তীক্ষ্ণ কন্ঠে বলল, “ছেলেটাকে দেখলেই তো বোঝা যায় সে একেবারে সহজ সরল। তোমাদের মত মেয়ে নিয়ে কাড়াকাড়ি করার মত ছেলে সে নয়। আমি চাই তুমি তোমার বন্ধুকে ফোন করে এখনই সব মিটিয়ে ফেল। আমার মেয়ের বিয়ে আমি রাজুর সাথেই দেব। এতোদিন এতো ছেলে দেখিয়েছি, দেখেই না করে দিয়েছে। এই একটা ছেলেকে ওর ভালো লেগেছিল, আর তুমি আর তোমার বন্ধু – দুই ধড়িবাজ মিলে আমার মেয়ের জীবনটা ছারখার করার চেষ্টা করছ। এটা আমি হতে দেব না। এখনই ফোন তোল।”

রাব্বি জেদী গলায় বলল, "মরে গেলেও না। ঐ শালা আগে আমার পা ধরে মাফ চাইবে, তার পর বিয়ে।"

শীলা একটু নরম হল। "পা ধরে মাফ চাইতে হবে কেন? মুখে বললেই তো হয়।"

ভাবল রাব্বি। "ঠিক আছে। পা ধরতে হবে না। শালা মীর জাফর!"

মা মেয়েতে চোখাচোখি হল। মুচকি হাসল শীলা।

৫

মোতালেব যে এইরকম একটা কাজ করে বসবে চিন্তাও করে নি শিলা। লীলা ভাবীকে রাব্বির শর্ত বলার পর তিন দিনও যায়নি, শনিবার রাতে জ্ঞাতি গুষ্টি সবাইকে নিয়ে এসে হাজির। তাকে বলা হয়েছিল শুধু ছেলে আর বউকে নিয়ে আসতে, তিনি নিজ উদ্যোগে মহারানীকেও নিয়ে এসেছেন। মহারানী যে পাঁচ ঘণ্টা দূরে মন্ট্রিয়লে থাকেন তা কে জানত? খবর পেয়েই ফ্লাই করে চলে এসেছে। স্বামী আসতে পারে নি। ছেলে ইউনিভার্সিটিতে যায়। ডর্মে থাকে। সে যদি মোটা সোটা, গুবদে দর্শন হত তাহলে শিলার কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু পঞ্চাশোর্ধ মহিলার চেহারা, শরীর আর সাজ গোজের যে মান, তাতে তার বয়েস দশ বছর কম মনে হয়। শিলা নিজে আজকাল সাজগোজ কমিয়ে ফেলেছে। মেয়ে বড় হয়েছে, বিয়ে দেবে, এখন মা হয়ে বেশী সেজেগুজে থাকলে কেমন দেখায়? কিন্তু রানীকে দেখার পর সে বাথরুমে গিয়ে মেকআপ আরেক পরত চড়িয়ে এসেছে। সে নিজে তো আর কারো চেয়ে খারাপ দেখতে নয়। তার পেছনেও কি কম ছেলেরা ঘুর ঘুর করেছে।

রাব্বি ইচ্ছে করে মোতালেবরা আসার একটু আগেই দোকানে গেছে। শুধু মাফে তার কাজ হবে না, সে একটু ভাবও দেখাতে চায়। মোতালেব ওরফে মোতুকে সে যে থোড়াই কেয়ার করে, এটা প্রমাণ না করা পর্যন্ত তার শান্তি হচ্ছিল না। শিলাকে বলে গেছে মোতু এলে তাকে যেন খবর দেয়া হয়। সে দোকান বন্ধ করে আসবে। শিলা রাগ করছিল কিন্তু কানে নেয় নি রাব্বি। ব্যাটা ধড়িবাজ, এতো বছরে ক্ষমা চাইল না আর যেই ছেলের বিয়ের ব্যপার এলো এখন লাফিয়ে আসছে মাফ চাইতে! রাব্বি কি ফেলনা! ক্ষমা চাইতে এলো আর বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে ক্ষমা করে দেবে। অপমানের ষোল আনা পুরন না করে সে ছাড়বে না। কম কষ্ট পেয়েছিল তখন? রানীর সাথে তার প্রায় লেগে যায় যায়, সবাইকে বলে পর্যন্ত বেড়িয়েছিল। রাণীর যখন বিয়ে হয়ে গেল কত অপমানই না রাব্বিকে সহ্য করতে হয়েছে। মৃত্যু পর্যন্ত সেই অপমান সে ভুলতে পারবে না।

খবর পাবার পর ঘড়ি ধরে আধা ঘন্টা পরে বাসায় এলো রাব্বি। সিঁড়ী বেয়ে উপরে এসে বাসার ভেতরে ঢুকতেই আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে এলো মতালেব। "আরে দোস্ত, যদি বলিস তোর পা ধরে মাফ চাইব। অল্প বয়েস ছিল, রানীর জন্য আমার মনেও একটু টান ছিল। এতো দিন ধর কেউ এসব মনে রাখে?" সে রাব্বিকে জড়িয়ে ধরে হা হা করে হাসতে লাগল।

রাব্বি তাকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিল। "এইটাকে মাফ চাওয়া বলে না।"

রাজু এক পাশে চুপচাপ বসে ছিল। সে খুক খুক করে কাশল। মোতালেবের হাসি থামল। “আচ্ছা, আচ্ছা, মাফ চাইছি রে বাবা। মাফ করে দে আমাকে। ক্ষমা করে দে। এবার দেখ কাকে এনেছি।”

রানী সোফায় বসে মিটি মিটি হাসছিল। তার উপর চোখ পড়তেই একেবারে জমে গেল রাব্বি। মনে হল সে যেন ভুত দেখছে।

রানী বলল, “কি , চিনতে পারছেন না? অনেক পালটে গেছি মনে হয়।”

রাব্বি নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। মোতালেব বলল, “ওরা তো দশ বছর আগে মন্ট্রিয়লে চলে এসেছে। ওকে তোর কথা বলতেই দেখা করতে চাইল। নিয়ে এলাম। আগে থেকে বলিনি আবার কি ভাবিস না ভাবিস। তুই তো আবার বরাবরই একটু ইমোশনাল।”

শিলার মেজাজটা একটু খারাপ হচ্ছে। এমন হাড় হাবাতের মত মহারানীর দিকে তাকিয়ে থাকার কি হয়েছে? সে নীচু গলায় বলল, “এখানে এসে বস, মুনিয়ার বাবা।”

রাব্বি নিরীহ ছেলের মত স্ত্রীর পাশে গিয়ে বসল। রানী হাসতে হাসতে বলল, “রাব্বি ভাই, আপনি কিন্তু একদম বদলাননি। এখনও সেই মিষ্টি মিষ্টি চেহারা, ছেলেমানুষী ভাব। কি যে ভালো লাগত!”

রাব্বি লাজুক হেসে বলল, “তোমার সাথে আবার এভাবে দেখা হবে চিন্তাও করি নি। ভালো আছো?”

“চলে যাচ্ছে,” রানী মিষ্টি হেসে বলল। “আপনার স্ত্রীর সাথে কথা হল। ইস, এত সুন্দর আর লক্ষী বউ আপনার, আপনাকে সবাই নিশ্চয় হিংসা করে?”

মুনিয়া বলল, “আর বলবেন না আন্টি, মাকে নিয়ে বাপী তো বেরই হতে পারে না। সবাই এমনভাবে তাকিয়ে থাকে!”

শিলা মেয়েকে একটা কনুই দিল। “ফাজলামী হচ্ছে! রানী আপা, আপনার কথা কিন্তু ও আমাদেরকে কখন বলে নি।”

রানী হেসে বলল, “রাব্বি ভাই সেই ছোটবেলা থেকেই লাজুক। আমিতো তাকে স্কুল থেকে চিনতাম। চার পাঁচ বছরের ছোট ছিলাম। উনি জানতেন আমি মোতু ভাইয়ের খালাতো বোন, তারপরও আমার সাথে কথা বলতে কত দিন লেগেছিল জানেন? চার মাস। আপনার সাথে তার কি করে দেখা হল?”

শিলার গাল লাল হয়ে উঠল। “আমাদের জানাশোনার বিয়ে নয়।”

রানী বলল, “আমারও না। মফঃস্বলে থাকতাম, রাজ্যের ছেলেরা পেছনে লেগেছিল বলে বাবা-মা ম্যাট্রিক পাশ করবার পর পরই বিয়ে দিয়ে দিলেন।”

মোতালেব ঠা ঠা করে হাসতে লাগল। “ওর বিয়ের পর আমি পুরো একদিন কিচ্ছু খাই নি। যা মন খারাপ হয়েছিল। আর রাব্বি তো পুরো এক মাস কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল জানিও না। যখন ফিরে এলো আমার সাথে আর কথা বলে না। কলেজ পর্যন্ত পালটে ফেলল।”

বীনা ধমকে উঠল। "থামবে তুমি? উনি অস্বস্তি বোধ করছেন। সবাই কি তোমার মত নির্লজ্জ নাকি?"

মোতালেবের হাসির জোর বাড়ল। রাজু কেশে গলা পরিষ্কার করল। এ কি যন্ত্রনা! তার বিয়ের আলাপ করতে এসে নিজেদের পুরানো প্রেম নিয়ে হা-হা-হি-হি চলছে। আশ্চর্য! তার মুখের ভাব দেখে খুব মজা পাচ্ছে মুনিয়া। অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছে অস্থির হয়ে আছে ছেলেটা। একটু মজা করতে ইচ্ছ হল। সবাই একটু থামতে সে ঝট করে বলল, "আন্টি, ভাবছিলাম আমি আর বিয়ে টিয়ে করব না..."

রাজু তড়াক করে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। "কি বলছ?"

মুনিয়া নিরীহ গলায় বলল, "ভাবছিলাম, এখন আর ভাবছি না।"

"ওহ!" হাঁফ ছেড়ে বাঁচল রাজু। "কবে হবে?"

বীনা খুক কর হেসে ধমকে উঠল। "এই ছেলে, আমরা এখানে আছি কি জন্য? চুপ করে বয়। এটা করব বলে কত বছর অপেক্ষা করেছি জানিস তুই? ঠিক বলেছি না শিলা?"

শিলার চোখ ভিজে গেছে। শেষ পর্যন্ত মেয়েটার বিয়ে ঠিক হতে যাচ্ছে। গতরাতে সে নাতী-নাতনীর নাম নিয়ে পর্যন্ত ভেবেছে। সে নিঃশব্দে মাথা দোলাল। কথা বলার সাহস পেল না। গলাটা আবেগে এমন বুজে এসেছে!

৬

রাজুর খুব সাহস বেড়েছে। সে একটু রাত হলেই মুনিয়ার সেল ফোনে কল দেয়। এটা সেটা নিয়ে অনেক কথা হয়। ভালোই লাগে মুনিয়ার। নিজেকে কিশোরী মনে হয়। সেই বয়েসের আবেগ আর উত্তেজনা তার হৃদয়কে প্লাবিত করে। রাজুর অবস্থা কোন অংশে ভালো নয়। এটাই তার নাকি প্রথম সত্যিকারের ভালোবাসা। বিয়ের এনগেজমেন্ট হয়ে যাওয়ায় তাদের এই আলাপ নিরুপুদ্রবে সারা যায় তবুও মুনিয়া চেষ্টা করে যতখানি সম্ভব বাবা-মায়ের অগোচরে করতে। তার লজ্জা লজ্জা লাগে।

এক শুক্রুবার রাতে সবাই বিছানায় যাবার পর দীর্ঘক্ষন আলাপ চলে। পরদিন অফিস নেই দু'জনার। দেরীতে ঘুমাতে গেলে সমস্যা নেই। দু' মাস বাদে বিয়ে। দু'জনে নানান জল্পনা কল্পনা করল কোথায় হানিমুন করতে যাবে তাই নিয়ে। কিছু ঠিক হল না। দেখতে দেখতে রাত দু' টা বেজে গেল। ফোন রেখে দিল। ঘুমাতে যাবার আগে পানি খাবার জন্য নিজের ঘর থেক বেরিয়ে রান্নাঘরে এলো। একটা নাইট লাইট মিটি মিটি জ্বলছে। তাতে দৃষ্টি ভালোই চলে। মাকে একটা চেয়ারে চুপচাপ একাকী বসে থাকতে দেখে খুব অবাক হল। মা ঘুম কাতুরে। বাবা ঘুমাচ্ছে আর মা এখানে একাকী বসে আছে, ভাবাই যায় না।

মুনিয়া মায়ের পাশে গিয়ে বসল। "কি হয়েছে মামনী? বাপীর সাথে ঝগড়া হয়েছে নাকি?"

মাথা নাড়ল শিলা।

“তাহলে?” মাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরল মুনিয়া। “মন খারাপ? আমি তো কোথাও যাচ্ছি না। বিয়ের পর তোমাদের সাথেই থাকব। রাজু বলেছে আমার সাথে এখানেই থাকবে। তুমি এটা নিয়ে একদম মন খারাপ কর না।”

নার্ভাস ভঙ্গীতে হাসল শিলা। “একদিন তো তোদের নিজের বাড়ী হবেই। সারা জীবন কি আমাদের সাথে থাকবি? তাছাড়া শ্বশুর বাড়িতেও তো মাঝে মাঝে গিয়ে থাকতে হবে।”

মাথা দোলাল মুনিয়া। “মাঝে মাঝে, হয়ত। কিন্তু তোমার মন খারাপ কেন বলত?”

মেয়ের হাত ধরল শিলা। “আচ্ছা, সত্যি কর বলত, আমাকে দেখে কি বুড়ী বুড়ী লাগে?”

মুনিয়ার বিস্মিত হবার পালা। “নাতো! তোমাকে দেখে তো চল্লিশও মনে হয় না। হঠাৎ তোমার মাথায় এই প্রশ্ন এলো কেন?”

“ঐ মেয়েটা – রানী না কি যেন, তোর বাবাতো ওকে এখনও মনে হয় পছন্দ করে। সেদিন দেখিস নি কিভাবে তাকাচ্ছিল? আর মেয়েটা এখনও কত সুন্দর! তোর সাথে রাজুর বিয়ে হলে তো তার সাথেও আমাদের প্রায়ই দেখা হবে। আমার না খুব চিন্তা হচ্ছে।”

মুনিয়া হাসবে না কাঁদবে ভেবে পাচ্ছে না। মানুষের বয়েসটা হচ্ছে বাইরে, ভেতরে ভেতরে তারা বোধহয় কোনদিন বেড়ে ওঠে না। সে সহজ গলায় বলল, “মামনী, তাহলে না হয় এখানে সম্পর্কটা না করলাম।”

শিলা ধমকে উঠল, “ধ্যাত! তাই বলেছি নাকি আমি? একটু ভাবনা হচ্ছে তাই তোকে বললাম। এসব কথা তো আর সবাইকে বলা যায় না।”

মুনিয়া মায়ের মুখ খানা দুই হাতে ধরল। “মামনী, বাপীর সাথে তোমার কতদিনের সংসার?”

“সাতাশ বছরের।”

“এখনও তোমার মনে সন্দেহ হচ্ছে?

“তুই ছেলেদের চিনিস না। যত বুড় হয় তত ওদের ভীমরতি ধরে। সেটা নিয়েই তো আমার ভয়।”

এবার হেসে ফেলল মুনিয়া। “তোমার দোকান্দারকে কেউ তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। যাও, খামাখা চিন্তা না করে ঘুমিয়ে পড়।”

শিলা উঠবার আগেই রাব্বি রান্নাঘরে এসে ঢুকল। “আর যেতে হবে না। তোদের বকবকানীতে আমার ঘুম ছুটে গেছে। আজকে আকাশে চাঁদ উঠেছে। চল, তিন জনে সামনের বারান্দায় গিয়ে বসি। তোর বিয়ে হয়ে যাবে। মনটা ভালো লাগছে না।”

ছোট বারান্দায় তিন খানা চেয়ার পাতা। পাশাপাশি বসল ওরা। আধখানা চাঁদ। বাতাসটা ঝিরিঝিরি। উষ্ণ। ওরা তিনজন শরীর ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে থাকে। এই ক্ষুদ্র ভালো লাগার মুহুর্তটা ওরা পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করে।